মাদ্রাসার অধ্যক্ষের কামুকতা

জিয়াউদ্দীন আহমেদ

| ঢাকা , রোববার, ১৪ এপ্রিল ২০১৯

যৌন হয়রানির অভিযোগে ফেনীর ইসলামিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে মামলা করার কারণে একই মাদ্রাসার আলিম (ইন্টারমিডিয়েট) পরীক্ষার্থী নুসরাত জাহান রাফিকে কয়েক দিন আগে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। বোরকা ও নেকাব পরা এক মেয়ে রাফিকে তার পরীক্ষার হলে এই মর্মে সংবাদ দেয় যে, মাদ্রাসার ছাদে তার বান্ধবী নিশাতকে মারধর করা হচ্ছে। ছাদে গেলেই যে চারজন সন্ত্রাসী রাফিকে ঘিরে ধরেছিল তাদের সবাই কালো চশমা, হাত মোজা, বোরকা ও নেকাবে ঢাকা ছিল। এই ছদ্মবেশী মেয়ে বা পুরুষ সন্ত্রাসীরা মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করে নিতে রাফির ওপর চাপ দেয়; রাফি সম্মত না হলে তারা রাফির হাত-পা বেঁধে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। রাফি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটের আইসিইউতে লাইফ সাপোর্ট নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঁচ দিন ধরে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। তার অবস্থা এতই আশঙ্কাজনক ছিল যে, চিকিৎসক অসহায় হয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে রাফির জীবনের জন্য প্রার্থনা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বাঁচার

আগ্রহে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে রাফি তার ভাইয়ের কাছে ক্ষীণ কণ্ঠে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করে; প্রধানমন্ত্রীও তার আবেদনে সাড়া দিয়ে সিঙ্গাপুর পাঠানোর ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু শত চেষ্টায়ও রাফির অবস্থা স্থিতিশীল না হওয়ায় সিঙ্গাপুর নেয়াও সম্ভব হয়নি, রাফিও বাঁচেনি।

দেশের প্রায় প্রতিটি মাদ্রাসা, মক্তব, এতিমখানার ছাত্রছাত্রীরা তাদেরই শিক্ষক দ্বারা অহরহ যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। মাদ্রাসা, মক্তবে যৌন নির্যাতনের ঘটনাগুলোর বর্ণনা পড়ে মনে হয়, ধর্মীয় মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট মাওলানা, ইমামদের মধ্যে কোন রেখাপাত করতে পারেনি। এসব মাওলানা, ইমাম ও মুয়াজ্জিনের বলাৎকার ও ধর্ষণের শিকার হয়েছে প্লে গ্রুপের ছাত্রছাত্রীও। এ লোকগুলোর ধর্ষণের কাহিনী বিকৃত ও অভিনব; ধর্ষণের অনেক কাহিনী পড়ে দেখলাম, কয়েকটি বাচ্চা ও শিশুর মুখে স্কচটেপ লাগিয়ে, হাত-পা বেঁধে ধর্ষণ ও বলাৎকার করা হয়েছে; কোন কোন ক্ষেত্রে চকোলেট দিয়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে গোসল করা বা গায়ে তেল মাখানোর ফজিলত বর্ণনা করার সময়, কখনো কখনো সওয়াব কামানোর বাণী দিয়ে, আবার কখনো কখনো বেহেস্ত পাওয়ার আশ্বাসবাণী শুনিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে। ধর্ষণের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, নির্যাতিত শিশুর যন্ত্রণার চিৎকার শুনে ধর্ষক মাওলানারা বেশি বেশি যৌন উত্তেজনা অনুভব করেছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে নোয়াখালীর সুবর্ণচরে দুটি ধর্ষণের ঘটনা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এখন আবার ফেনীর সোনাগাজীতে ঘটল রাফির ওপর চরম নৃশংসতা। কম বা বেশি পৃথিবীর প্রতিটি দেশে যৌন নির্যাতন রয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে মেলামেশা কিছুটা অবাধ বিধায় যৌন ক্ষেত্রে আমাদের দেশগুলোর মতো এমন বর্বরতা নেই। আমাদের দেশে চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে যৌন সম্ভোগেও কিছু লোক পুলকিত হয়। আমাদের দেশে যৌন সম্ভোগে সম্মতির ধার ধারে না, ঠিক আদিম যুগের মতো। আদিম যুগে বাহুবলে বলীয়ানেরা যখন খুশি যাকে তাকে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করত এবং তা তখন স্বাভাবিক হিসেবেই গণ্য হতো। বর্তমানে যৌন নির্যাতনের ব্যাপকতার জন্য অনেকে মূল্যবোধের অনুপস্থিতিকে দায়ী করে থাকেন। তাঁদের মতে ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে নৈতিকতা বিবর্জিত মানুষগুলোই এসব অপকর্ম করে থাকে। তাদের আরও অভিমত হচ্ছে, ধর্ম শিক্ষা দ্বারা নৈতিক চরিত্র সুদৃঢ় করা গেলে এসব অপকর্ম মানুষকে স্পর্শ করতে পারে না; আল্লাহর ভয়, পরকালে বিচারের ভীতি থাকলে মানুষ এমন করার সাহসই পাবে না। কিন্তু মেয়ে দেখলেই লালা পড়ে যেসব আলেমদের তাদের কুকীর্তির ইতিহাস পড়লে মনে হয়, এরা ধর্ম পড়ে শুধু অন্যকে শুনিয়ে পয়সা রোজগারের জন্য, নিজেরা তা মানে না, বিশ্বাসও করে না। ধর্ম মানলে তারা এমন অধর্ম করতে পারে না। ব্যভিচার বা ধর্ষণ মারাত্মক অপরাধ; ন্যায়-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা, দোজখের

আগুনে দগ্ধ হওয়ার ভীতিজনক শাস্তির ভয়ও এমন কুৎসিত প্রবৃত্তি থেকে আলেম, মাওলানা, ইমাম, মুয়াজ্জিনদের বিরত রাখতে পারছে না। এই লোকগুলো অহরহ পরকালের ভয়-ভীতি দেখিয়ে আমাদের ধর্মের পথে চলার পরামর্শ দিয়ে থাকে, অথচ এদের ধর্ষকের ভূমিকায় দেখলে মনে হয় না এরা আস্তিক ও ইমানদার। এরা চব্বিশ ঘণ্টা নাস্তিকদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে থাকে, কিন্তু বাস্তব জগতে এরা নাস্তিকদের চেয়েও ঘৃণ্য অপরাধ করে থাকে। মক্তব, মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীদের যেভাবে গরুর মতো পেটানো হয় তাতেই আলেমদের বিকৃত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই লোকগুলোর কুৎসিত দৃষ্টি থেকে কেউ নিস্তার পাচ্ছে না, সুযোগ পেলেই ছোবল মারছে।

অনুমতি ব্যতীত কিংবা জোরপূর্বক কারো সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করাই ধর্ষণ। ধর্ষণ নিয়ে ধর্মে কিছু বলা না হলেও জেনা বা ব্যভিচারের বিরুদ্ধে ধর্মে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। তাই ধর্মে ধর্ষণকে ব্যভিচারের মধ্যে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে। প্রচলিত আইনে পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্ভোগও ক্ষেত্র ভেদে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় না। বাংলাদেশের আইনে ধর্ষণের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ‘যদি কোনো পুরুষ বিবাহবন্ধন ব্যতীত ষোলো বৎসরের অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া, অথবা ষোলো বৎসরের কম বয়সের কোন নারীর

সাহত তাহার সম্মাতসহ বা সম্মাত ব্যাতরেকে যৌন সঙ্গম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।’ বাংলাদেশের আইনে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড। অন্যদিকে ইসলাম সম্মতি-অসম্মতি উভয় ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বিবাহবহির্ভূত দৈহিক মিলনকে দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে এবং স্বেচ্ছায় হলেও বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্ককে ধর্মে ব্যভিচার বলা হয়। ব্যভিচারী বিবাহিত হলে তাকে প্রকাশ্যে জনসম্মুখে বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর মেরে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার বিধান রয়েছে ইসলামে; অবিবাহিত হলে তাকে প্রকাশ্যে একশ’ বেত্রাঘাত মারা হবে। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একই শাস্তি। শরিয়া আইনে ব্যভিচারের কঠোর শাস্তির কথা বলা হলেও তার বাস্তবায়ন কঠিন। শরিয়া আইনে চারজন ন্যায়পরায়ন বয়স্ক পুরুষ মুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষী বা ধর্ষকের স্বীকারোক্তি ছাড়া অন্য কোন পন্থায় ব্যভিচার প্রমাণের কথার উল্লেখ নেই; এক্ষেত্রে কোন মহিলার সাক্ষীও গ্রহণযোগ্য নয়। একাদশ শতাব্দীতে স্পেনের ইমাম ইবনে হাজম প্রস্তাব করেছিলেন, জেনা প্রমাণের ক্ষেত্রে চারজন ন্যায়পরায়ণ মুসলমান পুরুষ সাক্ষী অথবা প্রতিজন পুরুষের পরিবর্তে দুজন মুসলিম ন্যায়পরায়ণ মহিলার চাক্ষুষ স্বাক্ষীও গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু তার প্রস্তাব শাফি, হানাফির ইমামেরা মানেননি, পেনাল ল অফ ইসলাম, ক্রিমিন্যাল ল ইন ইসলাম অ্যান্ড দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড ইত্যাদি

কেতাবে নারী সাক্ষী নিষিদ্ধই রয়ে গেছে। পাকিস্তানেও এই আইন বাতিলের প্রস্তাব উঠলে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী ক্ষিপ্ত হয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন করার ও সংসদ থেকে পদত্যাগের হুমকি দিয়ে বলেছিল, 'শরিয়াহ মোতাবেক এ আইনই সঠিক, এর কোনোরকম পরিবর্তন কোরান ও শরিয়ার খেলাফ।' ধর্ষিতা বিনা দোষে যাতে কাউকে হেনস্তা করতে না পারে তজ্জন্য এমন সাক্ষীর ব্যবস্থা ধর্মে রাখা হয়েছে বলে অনেক আলেম অভিমত ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু অন্যদের অভিমত হচ্ছে, কেউ নিশ্চয়ই চারজন ন্যায়পরায়ণ বয়স্ক মুসলমান বা আটজন মুসলমান নারীর সম্মুখে ব্যভিচার করবে না। ইমানদার বয়স্ক পুরুষ মুসলমান ব্যতিরেকে অন্য কারো সম্মুখে ব্যভিচার হলেও তা শরিয়াহ আইনে আমলযোগ্য নয়। এমন কি বোবার সাক্ষীও গ্রহণযোগ্য নয়। দাস, দাসী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী প্রভৃতি নীচু শ্রেণীর লোকদের সাক্ষী এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। অনেক ধর্মবেত্তা বর্তমান ডাক্তারি পরীক্ষাগুলো ব্যভিচার প্রমাণে গ্রহণযোগ্য বলে মত দিলেও অধিকাংশ আলেম তা মানতে নারাজ। শরিয়াহ আইনে হুদুদ মামলায় পারিপার্শ্বিক বা পরোক্ষ প্রমাণও গ্রহণযোগ্য নয়। হুদুদ মামলায় নারী বিচারকও অবৈধ। এ অবস্থায় মামলা করে স্বাক্ষী হাজির করতে না পেরে পরিশেষে ধর্ষিতা নারী মানহানী মামলার সম্মুখীন হন বা ব্যভিচারিণী হিসেবে গণ্য হন। সোমালিয়ার ১৩ বছরের কিশোরী আয়েশা দুহুলোকে কয়েকজন পুরুষ গণধর্ষণ করলে তার

বাবা শারয়াহ কোর্টে মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন; সাক্ষী না থাকায় শরিয়াহ কোর্ট গর্ভবতী আয়েশাকে পাথরের আঘাতে মৃত্যুদন্ড দেন এবং সেটা ২০০৮ সালে কার্যকর হয়। ধর্ষকের স্বীকারোক্তি না থাকায় বা প্রয়োজনীয় সাক্ষীর অভাবে জেনারেল জিয়াউল হকের আমল থেকে বহু মামলার মীমাংসা করা এখনও সম্ভব হচ্ছে না। এ ভয়ে পাকিস্তানের ধর্ষিতা নারীরা এখন আর অভিযোগ করে না।

শিশু নির্যাতনকারী সমাজের এই ভন্ড লোকগুলোই আবার ওয়াজ-মাহফিলে মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে কটূক্তি করে। বাংলাদেশে কোনো ধর্ষণের ঘটনা ঘটার পর কিছু লোকও আবার ইনিয়ে বিনিয়ে ধর্ষণের জন্য নারীর পোশাককে দায়ী করা শুরু করেছে। এরা এই বলে প্রচার করে যে, মেয়েদের পোশাকে শালীনতা থাকে না বলে পুরুষেরা প্রলুব্ধ হয়, কামুক হয়ে উঠে। কিন্তু শিশুদের বলাৎকার ও ধর্ষণের ক্ষেত্রে কোন পোশাক মাওলানা ও ইমামদের প্রলুব্ধ করে? মাদ্রাসা মক্তবে এরা সমস্ত শরীর ঢেকেই পোশাক পরে। অন্যদিকে উপরের ক্লাসের মাদ্রাসার ছাত্রীদেরও আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা থাকে; তাই এদের দেখে মাদ্রাসার শিক্ষকদের কামুকতায় উত্তেজিত হওয়ার কথা নয়। বোরকা, হিজাব, নেকাব পরেও রাফি তার মাদ্রাসার অধ্যক্ষের কামুক দৃষ্টি থেকে মুক্তি পায়নি। তাই মেয়েদের পোশাক গজ, ফিতা দিয়ে যারা মাপে তাদের লোলুপ দৃষ্টি পাথরের দেয়ালও ভেদ করতে পারে। যারা ধর্ষণের জন্য

নারীর পোশাককে দায়ী করে ওয়াজ করেন তাদের স্বল্প বসনা নারী দেখে ধর্ষণের জন্য হামলে পড়তে হয় না; তারা হামলে পড়ে এমন বাচ্চাদের ওপর যাদের পোশাক পরার বয়স এখনো হয়নি। শুধু মোল্লা-মৌলভী নয়, মন্দিরের পুরোহিত এবং গির্জার যাজকদের দ্বারাও বিভিন্ন বয়সের ছেলে ও মেয়ে শিশুরা যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও এমন অভিযোগ অসংখ্য। সমাজে এই ব্যাধি মহামারির মতো ছড়িয়ে গেছে। ধর্ষকদের কোন জাত, ধর্ম ও মান নেই। কয়েক দিন আগে পত্রিকায় দেখলাম, ফেসবুকের বন্ধু দ্বারা ধর্ষণের পর রাস্তায় কর্মরত পুলিশকে অভিযোগ করে ঐ মেয়েটি পুলিশ কর্তৃক দ্বিতীয়বার ধর্ষিত হয়েছে। নারীদের শুধু ভোগের বস্তু বলে মনে করা হয় বলেই জন্ম নেয় ধর্ষণের উদগ্র বাসনা; সুযোগ পেলেই নারীদেহের ওপর হামলে পড়ে তারা। ছোটবেলা থেকে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সহজ বন্ধুত্ব গড়ে তোলা সম্ভব হলে পুরুষ বা নারী সম্পর্কে অনেক কৌতূহল আপনা আপনিই মিটে যায়। স্কুল, কলেজে যৌনবিষয়ক শিক্ষা দেয়া গেলে ছাত্র, ছাত্রীরা যৌনতার অপব্যবহার রোধে কিছুটা সচেতন হতে পারে এবং সচেতন হলে ভুলের মাত্রাও হ্রাস পাবে। নারীদেহকে তখন আর শুধু সেক্সচুয়াল অবজেক্ট মনে হবে না। পোশাক পরার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে যৌনতার ব্যাপারে মেয়েদের দোষ দেয়ার মানসিকতা দূর করতে হবে। সম্প্রতি ভারতে ১২ বছরের কমবয়সী শিশু ধর্ষণে জড়িতদের সর্বোচ্চ

সাজা মৃত্যুদন্ড করা হয়েছে; বাংলাদেশেও এমন আইন করার বিষয়টি বিবেচনা করা হলে শিশু ধর্ষণ কমতে পারে।

[লেখক : বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক ও সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশনের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক]
eauddinahmed@gmail.com